Vol. 5 | No. 1 | 1961

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হারামণি (পঞ্চম খণ্ড)

Volume	5
Issue	1
Year	1961
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	June 15, 1961
DOI	10.62328/sp.v5i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v5i1.9
Pages	269-280
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

হারামণি (পঞ্চম খণ্ড) ॥ মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত ॥ বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ ॥ পৃ ২২৪ + ৬২ ॥ দাম সাড়ে পাঁচ টাকা ॥

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' আধুনিকপূর্ব বাংলা গীতিকাব্যের দুটি ধারার উল্লেখ করেছেন। এক, পাঁচালী-পদাবলীর ধারা— উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যার প্রাধান্য। আর এক, সাধন-গীতির ধারা— চর্যাগীতিতে যার সূত্রপাত, বৈষ্ণব রাগাত্মিক পদাবলীতে যার প্রকাশভেদ আর বাউল গানে যার পরিণতি।[১] উত্তর ভারতে কবীর, দাদূ, রজ্জব, রবিদাসের রচনায় ধর্মসমন্বয়পন্থী বা মানববাদী মিস্টিক গানের যে প্রসার ঘটেছিল বহু পূর্বে, বাংলা দেশে সেই মিস্টিক গানের বিকাশ ঘটেছে উনিশ শতকে, বাউলদের রচনায়। সকল ধর্মের উর্ধে সহজ সরল মানবতাকে এঁরা যেমন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি দেহের রহস্যভেদের নানারকম প্রয়াসের মধ্যে এঁদের আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি মুক্তি খুঁজেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাউল গানের কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। লালশশী-সংকলিত 'কর্তাভজার গীতাবলী' (প্রথম খণ্ড, ১২৭৭), হৃদয়-লাল দত্ত-সংকলিত 'বাউল-সঙ্গীত' (১৮৮২ ?), তিনকড়ি স্মৃতিরত্ন-সংকলিত 'বাউল-সঙ্গীত' (দু খণ্ড, ১৮৮২) এবং দয়ালচাঁদ ঘোষ-সংকলিত 'বাউল-সঙ্গীত' (১২৮৯) এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।[২] পরে বেরিয়েছিল হরিদাস বাবাজীর 'বাউল সঙ্গীত' (কলিকাতা, ১৮৮৪)[৩] এবং নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ 'বাউল সঙ্গীত' (কলিকাতা, ১৮৮৬)[৪]।

সম্ভবতঃ স্মৃতিরত্নের সংকলনটির সমালোচনা করতে যেয়ে তখনো পর্যন্ত অবহেলিত বাউল গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাউল গানের সহজ সরল ভাবসম্পদ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির আন্তরিকতা এবং অন্তর্নিহিত রসস্ফূর্তিতে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সেদিন লিখেছিলেন ঃ

> গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ (যে বিষয়ের ও যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভাল করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখদুঃখ আশাভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না।[৫]

পরে, তিনি যখন এলেন পূর্ববঙ্গে জমিদারীর কাজ দেখতে, তখন বাউল গানের সঙ্গে তাঁর আরো প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল এবং সুযোগও মিলল বাউল গান-সংগ্রহের। ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর সংগৃহীত এরকম কয়েকটি গান প্রকাশিত হয়েছিল। তবে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অনেক বেশী গান। কুষ্টিয়ার আশ্রমে রক্ষিত লালন ফকীরের গানের খাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় তিন শ' গান নকল করিয়ে নিয়ে যান।

শিক্ষিত বাঙালী সমাজে বাউল গানের পরিচয়দানে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। তাঁর পর এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর। ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের যে বিশেষ তত্ত্বে তিনি আস্থাবান ছিলেন, তারই পোষকতা তিনি দেখতে পান বাউল গানগুলিতে। এসব গান তাই তাঁর প্রিয় ছিল এবং তাই এর সংগ্রহে-সংরক্ষণে তিনি মনোযোগী হয়েছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার "হারামণি" বিভাগে তাঁর কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হয় এবং পরে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (১৩৫৭, ১৩৬২ ও ১৩৬৩) তিনি বাউল গানের ব্যাখ্যামূলক পরিচয় দান করেন।

এ বিষয়ে আর দুজন অধ্যাপকের কৃতিত্ব অবিসংবাদী। নানা দুরূহ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত বাউল গানের (বারমাসী জাতীয় কয়েকটি অন্য গানসহ) সংকলন 'হারামণি' (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৭) অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের শ্রম ও শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে। আর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বৃহদাকার 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' (কলিকাতা, ১৩৬৪)। এতে কেবল পাঁচ শতাধিক গানই সংকলিত হয় নি, বাউল সাধনার বিস্তৃত পরিচয় ও এই মতবাদের উৎসসন্ধানে গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। ডক্টর মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র-সম্পাদিত এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'লালন-গীতিকা' (কলিকাতা, ১৯৫৮) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের

সংগৃহীত গানগুলি এবং কুষ্টিয়া থেকে ডক্টর দাশ কর্তৃক সংগৃহীত গানগুলি মিলিয়ে এতে ৪৬০টি গানের পাঠ নির্ণয় করা হয়েছে। নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ডক্টর মযহারুল ইসলামের 'কবি পাগলা কানাই' (রাজশাহী, ১৯৫৯) আরেকজন বাউল কবির গানের সংগ্রহ হিসেবে এই তালিকাভুক্ত হতে পারে।

সমালোচ্য বইটি 'হারামণি'র পঞ্চম খণ্ড। প্রথম খণ্ড 'হারামণি'-প্রকাশের এক যুগ পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এর আরেকটি খণ্ড প্রকাশিত হয় (কলিকাতা, ১৯৪২)। এতে ২৭৪টি লোকসংগীত সংকলিত হয়েছে—তার মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক গান অবশ্য বারমাসী, সারিগান ইত্যাদি শ্রেণীভুক্ত। পরে মনসুরউদ্দীন সাহেব স্বয়ং তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন (এ বইটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি)। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, ১৯৫৯)। ৯৪ পৃষ্ঠা ভূমিকার পর ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী যে গানগুলি এতে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বাউল গান প্রায় নেই বললেই চলে। 'সাহিত্য পত্রিকা'য় (বর্ষা ১৩৬৫) 'হারামণি'র আরেকটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে (বর্তমান বইয়ের ভূমিকায় মনসুরউদ্দীন সাহেব একে অভিহিত করেছেন 'হারামণি'র ষষ্ঠ খণ্ডরূপে)। মোটকথা, বিষয়ের একনিষ্ঠতায়, শ্রমস্বীকারের কুণ্ঠাহীনতায়, এবং সংগ্রহের বিপুলতায় মনসুরউদ্দীন সাহেব বাংলা সাহিত্যের রসিক পাঠক ও ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধালাভ করবেন।

বাউল গানের সংগ্রহে অধ্যাপক সাহেব যে শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, দুঃখের বিষয়, তার সম্পাদনায় ও পরিবেশনে সেই নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দেন নি। তাঁর সংগ্রহগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই যে কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

> মনসুরউদ্দীন সাহেব এ বিষয়ে অগ্রণী ও পথিকৃৎ হলেও তাঁর সংগৃহীত গান ও গ্রন্থগুলো আদৌ সম্পাদিত নয়। (পৃ ৵)

এ বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিযোগ আরো প্রবল। মনসুরউদ্দীন সাহেবের কৃতিত্ব স্বীকার করে তিনি বলেছেন যে, তাঁর সংগৃহীত গানগুলি

> এমন বিকৃত, খণ্ডিত, অশুদ্ধ ও অনেকস্থলে অর্থহীন যে লালনের গানের সম্যক পরিচয়প্রদানে তাহাদের সার্থকতা নাই।[৬]

বর্তমান খণ্ডটি সেদিক দিয়ে একটি ব্যতিক্রম। এই খণ্ডের সম্পাদকরূপে দুজনের নাম মুদ্রিত হয়ে থাকলেও উভয়ের ভূমিকা থেকে একথা স্পষ্ট যে,

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন গানগুলির সংগ্রাহক এবং মুহম্মদ আবদুল হাই এর সম্পাদক। এই সংগ্রহে ৩২৫টি গান আছে। এর মধ্যে প্রথম ২২৫টি গানের রচয়িতা লালন ফকীর এবং শেষ ১০০টির রচয়িতা পাগলা কানাই। ৩২৫টি গানের অধিকাংশই এই সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হল। তবে বেশ কিছুসংখ্যক গান 'হারামণি'র অন্যান্য খণ্ডে কিংবা অন্য সংগ্রাহকের সংকলনে পাওয়া যাবে। বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদনায় আবদুল হাই সাহেব 'লালন-গীতিকা'র সম্পাদনারীতির অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। "ইচ্ছামতো পাঠশুদ্ধ না করে" তিনি "পাঠ-বৈচিত্র্য উল্লেখ" করেছেন। বিস্তৃত পাঠান্তর সংযোজন করাই এ-জাতীয় সংকলনের পক্ষে একদিকে যেমন নিরাপদ, অপরদিকে তেমনি (পাঠক বা গবেষককে তা অভিপ্রেত পাঠের ইঙ্গিত দেয় বলে) বাঞ্ছনীয়। এর চাইতেও মূল্যবান হয়েছে অর্থ-সংকেতটি—যা পাঠকমাত্রকেই বাউল গানের মর্মগ্রহণে সাহায্য করবে। অর্থ-সংকেতের ব্যাপারে হাই সাহেব নির্ভর করেছেন উপেন্দ্রনাথের বইটির উপরে। পাঠশুদ্ধির বিষয়ে যেমন, তেমনি এক্ষেত্রেও মনসুরউদ্দীন সাহেব কোনরকম আলোক-পাত করেন নি, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে প্রমাণহীন মৌলিক বক্তব্য সন্নিবেশ করার থেকে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের মতামত সব সময়েই অধিক নির্ভরযোগ্য। হাই সাহেব তাই ভুল করেন নি। মনসুরউদ্দীন সাহেবের সংগ্রহে এই প্রথম পাঠান্তর ও অর্থ-সংকেত দেখে আমরাও তৃপ্তিলাভ করেছি।

গানগুলো সাজানো হয়েছে বিষয়ানুযায়ী, যথা, হাম্‌দ ও না'ত, আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মন, মনের মানুষ, ভাব, সাধন, গুরুতত্ত্ব, মুরশিদী প্রভৃতি। মুরশিদী ও গুরুতত্ত্ব বলে দুটি পৃথক বিষয়-সন্নিবেশের যৌক্তিকতা খুব স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। ৬ ও ৭ সংখ্যক গানদুটিকে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত না করে এর একটিকে মূল গান ধরে পাঠান্তর হিসেবে পাদটীকায় আরেকটি গান মুদ্রিত করলেই সঙ্গত হত।

বাউল সাধনা, বাউল মতবাদ ও বাউল-গীতির মর্ম ব্যাখ্যা করে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই ধরণের সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে প্রত্যাশিত ছিল। আবদুল হাই সাহেবের ছ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র ভূমিকাটিতে সাধারণভাবে গ্রন্থ-সম্পাদনার প্রণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং লালন ফকীর ও পাগলা কানাইয়ের সময় নির্ধারণের বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াস আছে। এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এরপর সন্নিবিষ্ট হয়েছে মনসুরউদ্দীন সাহেবের ছত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ "বাউল সাধনা"।

মনসুরউদ্দীন সাহেব এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলেই হয়তো এই ভার তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়েছিল। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হবে, এখানে আমাদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমান বইয়ের ভূমিকায় পরিশ্রমলাঘবের জন্য তিনি 'হারামণি'র অন্যান্য খণ্ডের ভূমিকার অনেক কথা, অনেক উদ্ধৃতি হুবহু ব্যবহার করেছেন। এখানে তার একটা তালিকা দিই :

পঞ্চম খণ্ড	চতুর্থ খণ্ড
(১) পৃ ।।৴ শেষ লাইন ও পৃ ।।৵ প্রথম বারো লাইন	(১) পৃ ৮ শেষ ১৫ লাইন
(২) পৃ ১৴ শেষ প্যারাগ্রাফ	(২) পৃ ১৮ শেষ দুই প্যারাগ্রাফ
(৩) পৃ ১।।৶ শেষ প্যারাগ্রাফ ও উদ্ধৃতি	(৩) পৃ ৬৭ প্রথম প্যারাগ্রাফ ও উদ্ধৃতি
(৪) পৃ ২৵ শেষ প্যারাগ্রাফ ও পৃ ২৶ উদ্ধৃতির অনুবৃত্তি	(৪) পৃ ১১ শেষ প্যারাগ্রাফ ও পৃ ১২ উদ্ধৃতির অনুবৃত্তি
(৫) পৃ ২।৴ বিশা ভুঁইমালির গান ও সংকলকের মন্তব্য	(৫) পৃ ১২ বিশা ভুঁইমালীর গান ও সংকলকের মন্তব্য

পঞ্চম খণ্ড	দ্বিতীয় খণ্ড
(৬) সম্পূর্ণ পৃ ৸৵ ও পৃ ৸৶ প্রথম ১২ লাইন	(৬) সম্পূর্ণ পৃ ১৪ ও পৃ ১৫ প্রথম ও তৃতীয় প্যারাগ্রাফ
(৭) পৃ ।৶ শেষ প্যারাগ্রাফ ও পৃ ।। এ তার অনুবৃত্তি	(৭) পৃ ৫ তৃতীয় প্যারাগ্রাফ

দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ৬) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবীণা' থেকে একটি উদ্ধৃতি আছে :

> সহজভাবে জীবনযাপন এবং ধর্ম্ম সাধন করাই বাউলদের উদ্দেশ্য, সেইজন্য তাহারা চুল দাড়ি বাড়িতে দেয়, কিছুই কাটে না।

বর্তমান খণ্ডে এই কথাটাই বলেছেন মনসুরউদ্দীন, কেবল এবার তিনি উদ্ধৃতিচিহ্ন দেন নি, ঋণও স্বীকার করেন নি :

> সহজভাবে এরা জীবনযাত্রার পক্ষপাতী বলেই কেশ গুম্ফ এবং শ্মশ্রুর সংস্কারের পক্ষপাতী নয়। (পৃ ।।)

মনসুরউদ্দীন সাহেব আফসোস করেছেন: "লালন ফকির সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের সাহিত্যিকরা পোষণ করেন না।" (পৃ ॥৶) কিন্তু তার জন্য সাহিত্যিক বা পাঠকের চেয়ে গবেষকের দায়িত্বই বোধহয় বেশী। মনসুর উদ্দীন সাহেব লালন ফকীরের জীবনকাল সম্পর্কে বিভিন্নস্থানে যেসব তথ্য সন্নিবেশ করেছেন, তার একটা তালিকা পেশ করি। তাহলে বোঝা যাবে যে, কেবল সাহিত্যিকরা নন, আমাদের গবেষকেরাও অনেক সময়ে "কোন স্পষ্ট ধারণা" পোষণ করেন না।

(১) লালন শাহ্ নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করেন।...আজ [১৯৪০] প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।[৭]

(২) তাঁহার জন্ম ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে।[৮]

(৩) লালন শাহ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬ বৎসর বয়সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার ছেঁউড়িয়া গ্রামে এন্তেকাল করেন।[৯]

(৪) লালন ফকীরের জন্ম হয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে।[১০]

আশা করেছিলাম যে, বর্তমান খণ্ডে তিনি যে ধারণা প্রদান করতে প্রয়াস পাবেন, তা অন্ততঃ স্পষ্ট হবে। কিন্তু, আফসোসের কথা, তা হয় নি। এখানে তিনি প্রথমে বলেছেন যে লালন

> কুষ্টিয়া থেকে মাইল তিনেক দূরে ভাঁড়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে এবং প্রায় সত্তর বছর পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেন। (পৃ ॥৶)

কয়েক পৃষ্ঠা পর বলেছেন:

> লালন ফকিরের জন্ম হয় ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে। সুদীর্ঘ ১১৬ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। (পৃ ১॥৶)

পনেরো পৃষ্ঠার ব্যবধানে এ মন্তব্যদুটিতে লালনের বয়সের ভেদ হয়েছে ছত্রিশ বছর।

নিজের রচনার যে দুটি উল্লেখ করেছেন মনসুরউদ্দীন সাহেব, আশ্চর্যের বিষয়, তাও অভ্রান্ত নয়। একটু খেয়াল করলেই তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন যে, ১৩২৬ এর 'প্রবাসী' ও ১৩৬৬র 'সাহিত্য পত্রিকা'য় তাঁর কোন রচনা প্রকাশিত হয় নি।

আলোচ্য ভূমিকায় বিভিন্ন পণ্ডিতজনের রচনা থেকে যেসব উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছেন, তার অধিকাংশই খণ্ডিত, বিকৃত ও অশুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' থেকে যে তিনটি অংশ তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার একটিও প্রমাদহীন নয়। একটি ত্রুটি মারাত্মক। মনসুরউদ্দীন উদ্ধৃত করেছেন ঃ

> উপনিষদে আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। (পৃ ১৷৷)

মূল বাক্যটি হচ্ছে

> এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল।[১১]

৷৷⁄ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে একটি বাক্যের মধ্যের অংশটি বাদ পড়ে গেছে, 'দুর্গতি' হয়েছে 'দুর্নীতি' এবং মূল শব্দের রূপান্তর আছে আরো। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর 'ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা' (কলিকাতা, ১৩৫৮) থেকে যে দুটি উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছেন (পৃ ৵ ও ৵⁄) তাও বিকৃত। ক্ষিতিমোহনের সাধুভাষা উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যেও কথ্য ভাষায় পরিণত হয়েছে। অনেক শব্দ বর্জিত, অনেক শব্দ বিকৃত এবং একটি শব্দ সংযোজিত হয়েছে। ক্ষিতিমোহনের 'নিত্যনাথ' মনসুরউদ্দীনে 'নিত্যলাল' হয়েছে, 'গঙ্গারাম' হয়েছেন 'গদা রায়', 'ছিলেন' হয়েছে 'ছিল'। ক্ষিতিমোহনের উদ্ধৃত গানের চরণ "মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ দিবে সে কি ধরা" মনসুরউদ্দীন সাহেবের হাতে "মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ ধরা দিবি কিসে" রূপ পেয়েছে। মনসুরউদ্দীন সাহেব সর্বাপেক্ষা বিকৃত করেছেন ইকবালের বাণী। মনসুরউদ্দীন সাহেবের উদ্ধৃতি এরকম ঃ

> It must be remembered that Sufi fraternites (e. g. **Naqsha Bandi**) **derived** or rather borrowed from the Indian **Buddhists** other means **to bring** about this **relation they** taught imitating the Hindu doctrine of **Vedanta** that there are six great centres of light of various colours in the body of man. (১⁄)

পাশাপাশি উদ্ধৃত করি ইকবালের মূল কথা ঃ

> It must, however, be remembered that **some later** Sufi fraternities (e. g., Naqshbandi) devised, or rather borrowed from the Indian **Vedantists** other means **of bringing about** this **Realisation**. They taught imitating the Hindu doctrine of **Kundalini**, that there are six great centres of light of various colours in the body of man.[১২]

এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। গোল্‌ডজিহরের বইটির সংস্করণ ও পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং রিস ডেভিডসের বইটিরও সংস্করণ নির্দেশ করা উচিত ছিল। ১৪ নম্বর পাদটীকাটি মনসুরউদ্দীন সাহেব বোধহয় পরে বসিয়ে দেবেন মনে করেছিলেন, কিন্তু ছাপার পরও সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয় নি।

কেবল উদ্ধৃতি নয়, বইয়ের নামও মনসুরউদ্দীন সাহেব পাল্টে দেন। 'হারামণি'র দ্বিতীয় খণ্ডে যে বইয়ের নাম 'শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্ত্তমান যুগ' (পৃ ১৮৶, ২৶), বর্তমান খণ্ডে সে বইয়ের নাম 'শরৎকুমার লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (পৃ ।৷৶)।

উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলব। "জ্ঞানই একমাত্র সেতু" কথাটার সমর্থনে মনসুরউদ্দীন সাহেব চাটিলের চর্যার যে চারটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন (চার চরণ উদ্ধৃতিতে পাঠের গোলযোগ আছে অন্ততঃ পাঁচ জায়গায়), তার অর্থ হল ঃ

> ভবনদী গহন গম্ভীর, বেগে প্রবাহিত। দু ধারে কাদা, মাঝখানে থৈ পাওয়া যায় না। ধর্মার্থে চাটিল সাঁকো তৈরী করেছে। পারগামী লোক নির্ভরে পার হয়ে যাচ্ছে।[১৩]

বলা বাহুল্য, এই চরণ চারটিতে সেতুর উল্লেখ থাকলেও জ্ঞানই যে সেতু, একথার সমর্থন নেই। তাঁর উচিত ছিল এর পরবর্তী চরণ দুটি অন্ততঃ উদ্ধৃত করা ঃ

> ফাড়িঅ মোহতরু পাটী জোড়িঅ।
> অদঅ দিঢ়ি টাঙ্গি নিবাণে কোড়িঅ॥

যার অর্থ ঃ

> মোহতরু ফেড়ে পাটি জোড়া হয়েছে, অদ্বয় (জ্ঞান)-রূপ দৃঢ় টাঙ্গি নির্বাণের জন্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[১৪]

মনসুরউদ্দীন সাহেব বলেছেন ঃ

বহু মুসলমান দরবেশ ও সাধক যথা শেখ সাদী, শামসী তেব্রিজ, মনসুর হাল্লাজ প্রভৃতি উত্তর ভারতে আসেন, এবং তাঁরা আসামে ও বাঙলায় আসেন নি। 'অমৃতকুণ্ড' এই ধরণের একখানি আরবী গ্রন্থ যার রচয়িতা ছিলেন মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী, আর এসেছিলেন গৌড়ে অধ্যাত্ম সাধনার তথ্য জানতে। (পৃ ১।।)

শেখ সাদী উত্তর ভারতে এসেছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। কেউ কেউ বলেন, মনসুর হাল্লাজও নাকি গুজরাটে এসেছিলেন কখনো—যদিও এ মত সর্ববাদিসম্মত নয়। শামসী তাব্রিজ উত্তর ভারতে এসেছিলেন, একথা আমার (এবং আরো অনেকের) আগে জানা ছিল না। এই তথ্য তিনি কোথায় পেলেন, তা উল্লেখ করা উচিত ছিল। 'অমৃতকুণ্ডে'র মধ্য এশিয়াবাসী রচয়িতার নাম কি তিনি বলতে পারেন? 'অমৃতকুণ্ডে'র মূল লেখক তো একজন হিন্দু—যিনি বইটি লেখেন হিন্দীতে বা সংস্কৃতে। তারপর এর আরবী অনুবাদ করেন রুকনুদ্দীন সমরখন্দী। তিনি এ বইয়ের লেখক নন, অনুবাদক; এবং তিনি গৌড়ে এসেছিলেন অধ্যাত্ম সাধনার তথ্য জানতে নয়, ইমামতী করতে। এই আরবী অনুবাদ অবলম্বন করেই পরে 'অমৃতকুণ্ডে'র পৃথক আরবী সংস্করণ এবং ফারসী ভাষ্য তৈরী হয়।[১৫] এসব মন্তব্যে মনসুরউদ্দীন সাহেব অতি-সরলীকরণের যে পথ বেছে নিয়েছেন, তা সত্যিই বিভ্রান্তিকর।

বাউল-সাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

বাউলেরা সহজ জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। এই জীবন ধারণা আমার মনে হয় বৌদ্ধধর্ম প্রসূত। বৌদ্ধ এবং বাঙলার বাউল উভয়ই এক ধর্মী। অর্থাৎ আচারের মরুবালুকারাশি এদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। (পৃ ।।)

এখানে আমাদের মনে যে প্রশ্ন জাগে, তা হচ্ছে 'বৌদ্ধধর্ম' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন আর 'বৌদ্ধ' বলতেই বা কাদেরকে বুঝিয়েছেন? খৃষ্টের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে, কিন্তু স্থানকাল ও সম্প্রদায়ভেদে এই বৌদ্ধধর্মের রূপ বিভিন্ন। হীনযান, মহাযান ও তন্ত্রযানের মধ্যে পার্থক্য যে বিস্তর, একথা সকলেই স্বীকার করবেন এবং এক মতবাদের লোককে অন্য মতাবলম্বী বললে কতখানি ভুল করা হয়, তাও অনুমান করতে

পারবেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও সুফীবাদের কাছে বাউল মতবাদের ঋণ আছে, একথা আমরা জানি। তাই তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরে নিই যে, 'বৌদ্ধধর্ম' বলতে মনসুরউদ্দীন সাহেব তন্ত্রযান বুঝিয়েছেন, তাহলেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। কেননা, সেখানেও কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযানের মধ্যে নানারকম পার্থক্য আছে। যে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের জীবনে 'আচারের বালুকারাশি' প্রায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন, তাঁদেরকে বলা হয় সহজযানপন্থী ; অন্য পক্ষে কালচক্রযানে আচারের প্রাধান্য আছে।[১৬] সহজযান বৌদ্ধধর্মকে বাংলার বৌদ্ধধর্ম বলা যা, তিলকে তাল বলাও তাই।

বাউলদের জীবনে আচারের প্রভাব নেই, একথাও কি সম্পূর্ণ স্বীকারযোগ্য? বরঞ্চ, বাউল সাধনার সঙ্গে নানারকম আচার—যাকে অনেকে বলবেন অনাচার—মিশ্রিত হয়ে রয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। মনসুরউদ্দীন সাহেব নিজেও সেকথা একাধিকবার স্বীকার করেছেন :

> বাউলদের মধ্যে কতকগুলি কুৎসিত ক্রিয়াকার্য্য প্রচলিত আছে বলিয়া শুনা যায়।[১৭]
>
> তান্ত্রিকদের পঞ্চ ম-কার মদ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা, মৈথুন এবং বাউলদের মলমুত্র রজঃ বীর্য্য প্রভৃতি আহার 'ভদ্রসমাজে' ঘৃণার্হ।[১৮]

আজকে তিনি যখন নতুন কথা বলতে চান, তার সমর্থনে নতুন প্রমাণাদি উপস্থিত না করলে, শুধু তাঁর মুখের কথায় আমাদের প্রত্যয় হবে কেন?

"হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতের মরমীয়া সাধনায় ষট্‌চক্রের" স্থান দেখে মনসুরউদ্দীন সাহেব বিস্মিত হতে চেয়েছেন (পৃ ১/)। বারো বছর আগে 'হারামণি'র চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকায়ও এজন্য তিনি একবার বিস্মিত হয়েছেন, যদিও ভারতীয় যোগসাধনার সঙ্গে সুফী মতবাদের এই মিলন বা ঐক্যের কথা দীর্ঘকাল আগে মারে টিটাস ও তারাচাঁদের জনপ্রিয় গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, এমন কি, ডক্টর এনামুল হক একথা বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন আজ থেকে পঁচিশ বছরেরও আগে।[১৯] এরপরও কি এই তথ্য বিস্ময়কররূপে নতুন?

মনসুরউদ্দীন সাহেবের ভাষায়ও একই ধরণের শৈথিল্যের উপস্থিতি পীড়াদায়ক :

(১) অবশ্য লালন সম্পর্কে 'বাঙালীর গান' ও 'শরৎকুমার লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' লালন ফকিরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। (৷৷৶)

(২) এইসব গান [পল্লীগান] বঙ্গ ভাষাভাষীদের মানস-স্ফূর্তির অলৌকিক নিদর্শন। (১৷)

(৩) কুম্ভীরে ত নদীতে নাম্‌লে লোককে খেয়ে ফেলে। (১৷৶)

(৪) বহু মুসলমান দরবেশ ও সাধক যথা শেখ সাদী, শামসী তেব্রিজ মনসুর হাল্লাজ প্রভৃতি উত্তর ভারতে আসেন, এবং তাঁরা আসামে ও বাঙলায় আসেন নি। 'অমৃতকুণ্ড' এই ধরণের একখানা আরবী গ্রন্থ যার রচয়িতা ছিলেন মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী, আর এসেছিলেন গৌড়ে অধ্যাত্ম সাধনার তথ্য জানতে। (১৷৷)

'বাউল সাধনা' প্রবন্ধটি বাদ দিলে 'হারামণি', পঞ্চম খণ্ড, একটি সুসম্পাদিত বাউল গানের সংগ্রহ। বাউল গান সম্পর্কে যাঁরা উৎসাহী, এই সংকলনটি তাঁদের কাজে আসবে।

১। ডক্টর সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (দ্বি-স ; কলিকাতা, ১৯৪৮), পৃ ৯৮৯-৯১ দ্রষ্টব্য।

২। ঐ, পৃ ৯৮৯, পাদটীকা।

৩। Blumhardt, J. F., *Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum* (London, 1886), p 122.

৪। Blumhardt, J. F., *Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum* (London, 1910), p 180.

৫। 'ভারতী', বৈশাখ ১২৯০, পৃ ৪০।

৬। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' (কলিকাতা, ১৩৬৪), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩-৪।

৭। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'হারামণি' [২য় খণ্ড] (কলিকাতা, ১৯৪২), পৃ ১৮ ও পৃ ১৮৶।

৮। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'হারামণি', চতুর্থ খণ্ড (ঢাকা, ১৯৫৯), পৃ ৬৫।

৯। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'হারামণি' [ষষ্ঠ খণ্ড], 'সাহিত্য পত্রিকা' (বর্ষা ১৩৬৫), পৃ ৯৭।

১০। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা' (ঢাকা, ১৯৬০), পৃ ৬৭।

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানুষের ধর্ম,' রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড (কলিকাতা, ১৩৫২), পৃ ৪০৬।

১২। Shaikh Muhammad Iqbal, *The Development of Metaphysics in Persia* (London, 1908), p 110.

১৩। Dr Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs* (Karachi, 1960), pp 11-12 এবং ডক্টর সুকুমার সেন, 'চর্যাগীতি-পদাবলী' (বর্ধমান, ১৯৫৬), পৃ ৫২-৫৫ দ্রষ্টব্য।

১৪। 'চর্যাগীতি-পদাবলী', পৃ ৫৪-৫৫।

১৫। 'অমৃতকুণ্ড'-সম্পর্কিত তথ্যটুকু ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর সৌজন্যে পাওয়া। তিনি মনে করেন যে, ইবনুল আরবী (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এর দ্বিতীয় আরবী সংস্করণের অনুবাদক।

১৬। Majumder, R. C. (ed.) *History of Bengal*, I (Dacca, 1943), 420. বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশপ্রসঙ্গে এই বইয়ের ৪১১-৪২৫ পৃষ্ঠা এবং বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রসঙ্গে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য' (কলিকাতা, ১৩৫৯) দ্রষ্টব্য।

১৭। 'হারামণি', [দ্বিতীয় খণ্ড], পৃ ১১।

১৮। 'হারামণি', চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২০।

১৯। Titus, Dr Murray T., *Indian Islam* (London, 1930), Ch. VIII; Dr Tarachand, *Influence of Islam on Indian Culture* (Allahabad, 1946), p 67; ডক্টর এনামুল হক, 'বঙ্গে স্বূফী প্রভাব' (কলিকাতা, ১৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

— আনিসুজ্জামান